টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে
ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায়
আমীরে জামায়াত
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর

ভাষণ

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

প্রকাশক
আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১ ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
জুন-২০০৯
আষাঢ়- ১৪১৬
জমা. সানি-১৪৩০

মূল্য : ৬.০০ (ছয়) টাকা।

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪৫৪১, ৯৩৫৮৩২

প্রকাশকের কথা

বরাক ও টুভ্যাল নদীর সংযোগস্থলে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করছে। (বরাক নদী বাংলাদেশে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে প্রবাহিত।) এ বাঁধ নির্মাণ আন্তর্জাতিক নদীনীতি ও পরিবেশ আইনের পরিপন্থি। ভারত একতরফাভাবে এ বাঁধ নির্মাণ করছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে যেভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মরুপ্রক্রিয়া চলছে। সেভাবেই টিপাইমুখ বাঁধ চালু হলে দেশের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলেও মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে- যা বাংলাদেশের মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে প্রকৃতির ভারসাম্য। মেঘনাসহ আমাদের ছোট-বড় সকল নদী শুকিয়ে যাবে। ভারতের এ পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২০ মে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উক্ত সমাবেশে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ তাঁর এ ভাষণটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে। আশা করি পুস্তিকাটি দেশপ্রেমিক জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলে

সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

[২০ মে, ২০০৯ টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বক্তব্যটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।]

আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আ'লা সাইয়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আস্‌হাবিহি আজমাঈন। ওয়া আলাল্লাজিনাত্তাবায়ুহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদদ্বীন।

ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জনসভার স্নেহাস্পদ সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট জামায়াত নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ, উপস্থিত প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

আজকের এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে ভাতে মারার, পানিতে মারার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে-সেই বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে। যেহেতু আজকের এ জনসভা ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম জনসভা। তাই আমি টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে কথা বলার আগে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই একটি কথা আরজ করতে চাই।

জামায়াতে ইসলামী কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, কোন দল বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, কোন বিশেষ একটি দেশেরও বিরোধিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, ইসলাম ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে সেই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ায়। আর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বসহ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে অভ্যস্ত।

জামায়াতে ইসলামী বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে অভ্যস্ত নয়। ক্ষমতায় যারাই থাকুক ও বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড সামনে আসলে সেটার বিরোধিতা করে জামায়াতে ইসলামী আল-কুরআন-এর ঘোষণার ভিত্তিতে "সহযোগিতা কর ভাল কাজের, নেক কাজের। খারাপ কাজের ও সীমালংঘনকারীদের সহযোগিতা করো না।" সংসদে এই নীতির আলোকে ভূমিকা পালন করেছি, সংসদের বাহিরেও এই নীতির আলোকে ভূমিকা পালন করে আমরা অভ্যস্ত।

আপনারা জানেন ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারী একটি নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সেই নির্বাচন হতে দেয়া হয়নি। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর এই পুরানা পল্টন এলাকায়, লগি-বৈঠার তাণ্ডব সৃষ্টি করে, অসংখ্য মানুষকে, রাজনৈতিক কর্মীকে হতাহত করে যে ১/১১ সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই ১/১১ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ছিল এটা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের অংশ।

এই ১/১১ এর পর দুই বছর যে অনির্বাচিত সরকার ঘাড়ে চেপে বসেছিল, তারা অর্থনীতিকে ২০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে, দেশকে রাজনৈতিকভাবে শূন্য করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে গেছে। তাদেরই মিশন বাস্ড়বায়িত হয়েছে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচনে কি হয়েছে, আমরা জেনেছি, দেখেছি- কিন্তু ঘুমের ঘোরে বোবায় ধরা মানুষের মত আমরা অসহায় ছিলাম তাই কিছুই করতে পারিনি, নির্বাচনে ডিজিটাল কারচুপি হয়েছে এটা অনুভব করেছি। এটাকে সত্যায়িত করেছেন ১৪ দলীয় জোটের শরীক দলের প্রধান সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, সাবেক সেনা প্রধান হুসাইন মোঃ এরশাদ সাহেব। মহাজোটের একটি বড় শরীক দলের প্রধান। তিনি বলেছেন, সেনাবাহিনীর সহযোগিতা না পেলে আ:লীগ জিন্দেগীতে ক্ষমতায় আসতে পারত না। তার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ: জলিল সাহেব বলেছেন, তাদের দলীয় সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রি নাকি কোন একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার পেইড এজেন্ট। আরেকজন কেবিনেট মন্ত্রী উচ্ছ্বাসের সাথে বলেছেন–বর্তমান সেনাপ্রধান একজন মহামানব। এই কথাগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হননি। তাদেরকে কোন মহল ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় বসিয়েছেন এটা আমরা জেনে বুঝেও নির্বাচন মেনে নিয়েছি গণতন্ত্রের স্বার্থে। অনির্বাচিত সরকারের চেয়ে নির্বাচিত সরকার ভাল। এই জন্য নির্বাচন মেনে নিয়েছি। আওয়ামী লীগের সরকার গঠনকে অভিনন্দিত করেছি। অভিনন্দনের সাথে সাথে তারা দেশের জন্য ভাল কিছু করলে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি। দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করলে, গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করতে চাই। আমি আজও বলতে চাই জামায়াতে ইসলামী গায়ে পড়ে রাজপথ গরম করায় বিশ্বাসী নয়। যদি আমাদেরকে জোর করে রাজপথে ঠেলে দেওয়া না হয়। আমরা রাজপথ গরম করার মত কর্মসূচী এখনও চিন্ড়া করছি না। তবে দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ হলে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো তা গঠনমূলক, যুক্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের দৃষ্টিতে আনা।

সরকার পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পাঁচ সপ্তাহ না যেতেই ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার জন্য ব্যস্ড় হয়ে পড়েছে। জঙ্গি দমনের নামে 'সাউথ এশিয়ান টাস্কফোর্স' গঠন করে বাংলাদেশে বিদেশী সেনাবাহিনী আমদানীর জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। TIFA চুক্তি করা নিয়ে ব্যস্ড় হয়ে পড়েছিল। আমরা বলেছিলাম পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসছেন, মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মাঝে এসব নিয়ে অস্থির কেন? ট্রানজিট ও টাস্কফোর্স-এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশ রক্ষার বিষয়টি জড়িত। দেশের অর্থনীতির সাথে TIFA জড়িত। অতএব বিষয়গুলো নিয়ে দেশের চিন্ড়াশীল বুদ্ধিজীবীদের সাথে, বিশেষজ্ঞদের সাথে

চিন্ড়া-ভাবনা কর"ন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর"ন এতো তাড়াতাড়ি যদি এগুলো দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যান, আমরা সন্দেহ করতে চাই না, জনগণ সন্দেহ করতে বাধ্য হবে, বোধ হয় এই তিনটি বিষয় দেওয়ার ওয়াদা করেই তারা ক্ষমতায় এসেছে। আর তিনটি জিনিস পাওয়ার ওয়াদা নিয়েই তাদেরকে মহল বিশেষ তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই তিনটি বিষয় নিয়ে আপাতত কোন আলোচনা নেই, একটু নীরব মনে হচ্ছে। যদি এটা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, এই তিনটি চুক্তি করা থেকে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে থাকেন, তাহলে আমি সরকারকে শতভাগ সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু যদি নীরবে, নিশ্চুপে, চুপিসারে জনগণকে অন্ধকারে রেখে দেশের স্বার্থ বিরোধী এইসব চুক্তি করার জন্য অগ্রসর হন তাহলে সেটা আপনাদের নিজেদের জন্যও ক্ষতিকর হবে, দেশের জন্যও ক্ষতিকর হবে।

২০০৮ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের এই সব আপত্তি সত্ত্বেও আমরা তাদের সমর্থন দিয়েছিলাম, অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম

২ বছর ১/১১ এর ফসল, আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল ফখরউদ্দিন সাহেবের সরকার জাতিকে যে শ্বাসর"দ্ধকর অবস্থার মধ্যে রেখেছিল, নির্বাচিত একটি সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সেই অস্বস্ড়িকর অবস্থা দূর হবে, দেশবাসী শান্ড়ি-স্বস্ড়ি ফিরে পাবে। আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে, সত্যি কি জাতির

অস্বস্তি দূর হয়েছে? শান্তি-স্বস্তি ফিরে পেয়েছে? কেন পায়নি? এর প্রধান কারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই দখলদারী, টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজীর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ সরকার এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে নাই। ছাত্রলীগের নেতৃত্ব থেকে তিনি সরে গেছেন। এই সরে যাওয়ায় দুইটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে– একটি হল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে তিনি থাকেন কিভাবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন তার সরে যাওয়াটাই কি ঔষধ? সরে যাওয়ার পরে কি তার সোনার ছেলেরা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী থেকে বিরত হয়েছেন?

নির্বাচনের আগে দল থাকে। নির্বাচনের পর যারা ভোটে বিজয়ী হয়, একটি দলীয় সরকার হলেও জনগণের ভোটে যদি নির্বাচিত হওয়ার দাবী করেন, তাহলে তারা আর দলীয় সরকার নন, জনগণের সরকার, দেশের সকলের সরকার। কিন্তু ১৪ দলীয় মহাজোট, মহাজোটের প্রধান দল আওয়ামী লীগ দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বিরোধী দলের উপর মামলা, হামলার মাধ্যমে, ফ্যাসিবাদী তৎপরতা জোরদার করে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে দেশবাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করেছেন। নতুন করে জনগণ অস্বস্তি ও অশান্তিতে ভোগছে।

সরকারে যারা থাকে তাদের দায়িত্ব হল পরিস্থিতি ঠাণ্ডা রাখা এবং জাতিকে বিভক্ত-বিভাজনের পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আওয়ামী জোট সরকার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিভাজনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেখানে প্রতিবেশী দেশ টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে পানি আগ্রাসনের উদ্যোগ নিয়েছে, বিডিআর-এর পিলখানার হত্যাযজ্ঞের পথ ধরে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশ রক্ষা ব্যবস্থার প্রতি যে হুমকির সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকারের দায়িত্ব ছিল সকল বিরোধী দলকে আস্থায় নিয়ে, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে, এই পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থা নেওয়া। সেখানে সরকার নিজে মামলা হামলার মাধ্যমে বিভাজন, বিভক্তির দিকে জাতিকে ঠেলে দিয়ে জাতির ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অতীতে যে সমস্ত বিষয় নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। মীমাংসিত সেই সমস্ত বিষয় যেটা বর্তমানে আদৌ কোন ইস্যু হওয়ার মত না; সেই সব ইস্যুকে নতুন করে সৃষ্টি করে ইস্যু বানিয়ে দেশ ও জাতিকে আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে।

বিডিআর ঘটনা প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই বিডিআর সদর দপ্তরে সেনাকর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের শুরু থেকে তদন্ত পর্যন্ত সরকারের ভূমিকা, মন্ত্রীদের বক্তব্য নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিডিআর-এর ঘটনা সরকারের একটি বড় রকমের ব্যর্থতা হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান যে সমস্ত প্রোগ্রামে যান, প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সেখানকার পরিস্থিতি জেনেই প্রোগ্রামে যাওয়া হয়। গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ হলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের দপ্তর থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে যাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী ২৪ তারিখে গিয়েছেন কিন্তু ২৫ তারিখে ডিনারে যাননি। ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশ তিনি গেলে নাকি অসুবিধা হবে, এটা জেনেই তিনি যাননি। তিনি না গিয়ে ভাল করেছেন, আমি আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। কোন অঘটন ঘটলে, জাতি একটি Crisis-এ পড়ত, আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। কিন্তু এতটুকুর মধ্যে কেন তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখা হল? পরের দিন বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে আগত চৌকস সেনাকর্মকর্তাদেরকে এক জায়গায় পেয়ে তাদের হত্যা করা হল। এই হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে না পারা বর্তমান সরকারের বড় রকমের ব্যর্থতা।

আমরা জেনেছি সঠিক পদক্ষেপ নিলে এত সেনা কর্মকর্তা নিহত হত না, তাদের পরিবারের সদস্যরা নি:গৃহীত হত না। এমনকি মাত্র কিছু সংখ্যক জোয়ান এর সাথে জড়িত ছিল। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবে, পরে ব্যাপক সংখ্যক বিডিআর জোয়ান-এর সাথে জড়িত হয়েছে। এটার জন্য সরকারের দায়িত্বহীনতাই দায়ী। তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় সেনা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আংশিক নিয়ে প্রতিবেদন আকারে ছাপা হয়েছে। এতে সরকার ক্ষিপ্ত হয়েছেন

এবং বিক্ষুব্ধভাবে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন। আমার পরিষ্কার কথা অবাধ তথ্য প্রবাহের আইন আপনারা পাশ করেছেন, অবাধ তথ্য প্রবাহের আইন থাকলে সাংবাদিকদের কাছে তো তথ্য আসবেই। তার চেয়েও বড় কথা, আপনারা যদি রাখডাক করেন, তাহলে এই কাল্পনিক রিপোর্ট ছাপা হতেই থাকবে। কাল্পনিক রিপোর্ট ছাপা যদি বন্ধ করতে চান তাহলে স্বচ্ছভাবে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হুবহু অবিকল পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানার সুযোগ দিন। তাহলে কাল্পনিকভাবে কোন কথা কেউ ছাপতে পারবে না। সেনা কর্মকর্তাদের রিপোর্ট সম্পর্কে সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী একটি পত্রিকা Daily Star Comments করেছে, Army investigation restricted: Many finds inconclusive” GB Lead news থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় সেনাবাহিনীর তদন্ত কর্মকাণ্ডকে restricted কারা করল, কেন করা হল, সেনাবাহিনীর findings-এ যা আসবে তার উপসংহার তারা টানতে পারল না কেন? আমি পরিষ্কার বলতে চাই, বিডিআর সদর সপ্তরের ঘটনা, আমাদের অহংকার সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিডিআর যেমন চোরাকারবারীদের জন্য আতঙ্ক তেমনি বিএসএফ এর জন্য ছিল আতঙ্ক। সেই বিডিআরকে বিডিআর দিয়ে ধ্বংস করে আমাদের সীমান্ত অরক্ষিত করা হয়েছে। আর চৌকস সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার উপর দেশের বাহিরে থেকে হোক ভিতরে থেকে হোক, কোন হুমকির সৃষ্টি হলে, তার মোকাবেলা করাই সেনাবাহিনীর mandate এর অংশ। অতএব যে পিলখানার ঘটনা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকির সৃষ্টি করেছে, দেশ রক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে, সেই ঘটনার স্বচ্ছ তদন্ত সেনাবাহিনীকেই করতে দেওয়া উচিৎ ছিল। তারা তাদের পেশাদারিত্বের মাধ্যমে এবং তাদের যে mandate এর অংশ হিসাবে স্বচ্ছ তদন্ত করতে এবং প্রতিবেদন দিতে পারত। তাদের প্রতিবেদন দিতে restriction আরোপ করা হয়েছে কার স্বার্থে? এই প্রশ্ন একদিন না একদিন বুমেরাং হতে পারে।

এখন বিডিআর পুনর্গঠনের নামে অন্য প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে এবং সেখানে H BSF-এর পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে– যে বিএসএফ-এর আতঙ্ক ছিল আমাদের বিডিআর। BSF-এর গুলিতে আমাদের কৃষক মারা যায়। আমাদের ধান কেটে নেয়। বিডিআর সদস্যরা জীবন দিয়ে এগুলো ঠেকিয়েছে, পদুয়া বড়াইবাড়ীর ঘটনা তার প্রমাণ। এবারের বিডিআর-এর ঘটনায় আমাদের প্রতিবেশী দেশ পদুয়া বড়াইবাড়ীর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নেপথ্যে যে ঘটনা ঘটায়নি তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি বারবার বলেছি ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় যা ঘটেছে, এর সঠিক তদন্ত করতে হলে, নেপথ্য নায়কদের খুঁজে বের করতে হলে কলকাতা কেন্দ্রিক, দিল্লী কেন্দ্রিক মিডিয়ার ভূমিকা কি ছিল তা খুঁজে বের করতে হবে? সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে, আমাদের দেশীয় টিভি চ্যানেলের আগে, ভারতীয় টিভি চ্যানেলে কিভাবে সংবাদ প্রকাশিত হল, এর একটি জবাব আসা দরকার তদন্তকারী কমিটির কাছে।

আমরা এই ব্যাপারে আবার বলতে চাই তিন তিনটি তদন্ত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা হোক এবং সেনাবাহিনী যে restriction এর কারণে তাদের findings, তদন্ত রিপোর্টে দাখিল করতে পারেনি সে restriction তুলে নিয়ে তাদের রিপোর্ট পরিপূর্ণ করার সুযোগ দিতে হবে।

সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, জাতিকে বিভক্ত ও বিভাজনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পরিবর্তে দেশের সরকার হিসাবে জনদুর্ভোগ দূর করার জন্য, জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নিন। বিশেষ করে পানি ও বিদ্যুতের অভাবে জনগণ যে দুর্ভোগ ও কষ্ট করছে, সেই দুর্ভোগ দূর করার জন্য অধিকতর মনোযোগী হোন। তাহলে দেশবাসী কিছুটা শান্তি-স্বস্তি পাবে। দেশ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে যাওয়া থেকে হয়তবা রক্ষা পাবে। টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে আমার কথা একটাই। এই ব্যাপারে ভারতকে বিরত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সমস্যার গভীরতা বুঝার

জন্য সরকারকে চেষ্টা করতে হবে। সরকারের কয়েক মন্ত্রীর কথায় মনে হয়েছে, এই সমস্যার গভীরতা তারা মোটেও বুঝেননি।

আসল দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেছেন বাঁধ আগে দিক তার পর দেখা যাবে। ফারাক্কা থেকে তাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত ছিল। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ শেষে, বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল বাঁধ চালু করার আগে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা করে কোন দেশের কি পরিমাণে পানি হলে চলে সেটাকে নির্ণয় করে ফারাক্কা চালু করা হবে। কিন্তু সেই কথা ভারত রাখেনি। একতরফাভাবে ৭৪ এর ৩১ মে বাঁধ চালু করেছিল সেই পরীক্ষা মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকাকালীন শেষ আর হয়নি। ফারাক্কার কারণে সেচ ব্যবস্থায় কৃত্রিম বাঁধা সৃষ্টির ফলে ৩ লক্ষ একর ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার আর্দ্রতা হ্রাস পাওয়ার কারণে ৩০ লক্ষ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লবণাক্ততার কারণে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ৬৪ লক্ষ একর জমি আবাদের যোগ্যতা হারিয়েছে। টিপাই বাঁধ যদি চালু হয় এটা হবে তার চেয়েও মারাত্মক কুশিয়ারা-সুরমা নদী এবং এর সংলগ্ন মেঘনা নদীর পানির প্রবাহ কমে গিয়ে নদীগুলো মরে যাবে। আমাদের অহংকার পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। ফারাক্কার মাধ্যমে পদ্মা ও যমুনা মরে যাওয়ার পথে, মেঘনা যদি মরে যায় তাহলে বাংলাদেশ মরু ভূমিতে পরিণত হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন টিপাইমুখ বাধ দিলে পারমাণবিক বিস্ফোরণে যা ক্ষতি হয় তার চেয়েও বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ।

অতএব প্রথমে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের ক্ষতির দিকটি সরকারকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, বুঝতে হবে। তারপর এই ব্যাপারে আমাদের পানি বিশেষজ্ঞগণ, পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ, যে সমস্ত লেখালেখি করছেন সেগুলো থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে, সরকারকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে হবে। বিরোধী দলের আন্দোলন, বক্তব্য, কর্মসূচি কেন্দ্র করে যদি জনমত গড়ে উঠে সেটা সরকারের জন্য সহায়ক শক্তি হতে পারে যদি সরকার রাষ্ট্রনায়কোচিতভাবে এটা মূল্যায়ন করে। বিরোধী দলকে সাথে নিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে জনগণের শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে সরকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসলে শক্তি পাবে। এখানে মীমাংসা না হলে আন্তর্জাতিক ফোরামে তা ওঠাতে হবে। ফারাক্কা ইস্যু ৭৬ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব জাতিসংঘে নিয়েছিলেন বলেই ভারত বাধ্য হয়েছিল, ৭৭ সালে ফারাক্কার বিষয়ে পানি চুক্তি করতে। আমি বলতে চাই ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ বেআইনি হয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণও আন্তর্জাতিক নদী নীতি ও পরিবেশ আইনের পরিপন্থি। মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় একটি ছোট্ট দেশ। কলোরাডো নদীর উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা নিয়ন্ত্রণের ফলে তারা আন্তর্জাতিক আদালতে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক আদালত মেক্সিকোর পক্ষে রায় দিয়েছিল। জনগণের সমর্থনে তুষ্ট হয়ে আমাদের সরকার যদি এই ইস্যুটি আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যায়, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের পক্ষে এবং ভারতের বিপক্ষে রায় দিতে বাধ্য। কিন্তু আওয়ামী লীগের বন্ধুগণ কেন যেন ভারত ক্ষিপ্ত হতে পারে এই জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে যেতেই চান না।

মামলা হামলা, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, টেন্ডারবাজী ইত্যাদি কারণে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। যার প্রতিক্রিয়ায় জনগণের স্বাভাবিক জীবন, শিক্ষার পরিবেশ ও অর্থনীতি দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। শতকরা ২৫ ভাগ পোশাক শিল্প বন্ধের পথে, পাট শিল্পে ১৮ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে, সুতার বাজার ভারতের দখলে হওয়ায় ৩৫টি সুতার কল বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকার সুতা গুদামে পড়ে আছে।

আমি পাবনার মানুষ। পাবনা সিরাজগঞ্জ নিয়ে মিল্ক ভিটা একটি দুগ্ধ শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে। আর এই মিল্ক ভিটা'র দুগ্ধ যোগান দেয়ার জন্য জনগণের প্রচেষ্টায় অনেক দুগ্ধ খামার গড়ে উঠেছে। ভারত থেকে দুধ আমদানী সহজ করে দেয়ার কারণে মিল্ক ভিটা বাংলাদেশের লোকদের কাছ থেকে দুধ পুরোপুরী নিতে

পারছে না। দুধের দাম কমিয়ে দিয়েছে লিটার প্রতি সাত টাকা, এর পরেও দুধ ফেরত দেয়া হচ্ছে। যার কারণে রাস্তায় দুধ ফেলে দিয়ে জনগণ এর প্রতিবাদ করেছে। এটা যদি চলতে থাকে, তাহলে এতদিন যারা তিলে তিলে খামার গড়ে তুলেছে, এই সমস্ত কৃষকদের সর্বনাশ হবে। এটা গোটা বাংলাদেশকে দুগ্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে। অথচ এই ব্যাপারটিতে ভারতের স্বার্থ থাকার কারণে সরকার মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

দলীয়করণের কথা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন–চারদলীয় জোটের দলীয়করণের কারণে তিনি এখন সরকার চালাতে পারছেন না। তারা কথায় কথায় সাত বছর নিয়ে আসে। সাত বছরের দুই বছর কাদের? সাত বছরের দুই বছরের দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। তারা দাবী করেছেন ফখরুদ্দিনের সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। তাই গত দুই বছরে যা হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তাদের বহন করতে হবে। জোট সরকারের সময় শেষ হওয়ার পর দুই বছরে প্রশাসনের খোলনলচে পাল্টে দেয়া হয়েছে। ফখরুদ্দিনের সরকারের মাধ্যমে যে প্রশাসন সাজানো হয়েছে, সেই প্রশাসনের উপর ভর করেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছে। এখন তাদের কারণেই নাকি দেশ চালাতে কষ্ট হচ্ছে। এটা খোঁড়া যুক্তি ছাড়া আর কিছুই না। কথায় বলে নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। তাদের দলীয় করণের একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা এমন, তারা- ১০ সচিব, ২৮ অতিরিক্ত সচিব, ৩৯ যুগ্ম সচিব এবং ২৯ উপ-সচিবকে ওএসডি করছেন। সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও উপ-সচিবদের এই হারে ওএসডি করে, কাজকর্ম ছাড়া বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেয়া হয়, তাহলে কি প্রশাসনে গতি আসতে পারে? ডিজিটাল বাংলাদেশ কি এভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে?

আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখন ইসলামের উপরে এবং গণতন্ত্রের উপর আঘাত হেনেছে। প্রথম ক্ষমতায় এসে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইক্বরা বি-ইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' তুলে দিয়েছেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে দিয়েছেন, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দটি কেটে দিয়েছেন আর বাহাদুর শাহ পার্কের সাথে একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। এই কলেজের নাম পরিবর্তন করে কবি নজরুল ইসলাম করা হয়েছে। তার পরও ইসলাম থেকে যায় এই জন্য কবির নাম খণ্ডিত করে শুধুমাত্র কবি নজরুল কলেজ রাখা হয়েছে। এটা হচ্ছে ইসলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়।

তারা ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বাংলাদেশকে জঙ্গিদের আখড়া হিসাবে নিজেরাই বিদেশের কাছে জানান দিয়েছিলেন। দূতাবাসের মাধ্যমে Terrorism in the name of Islam নামের বুকলেট প্রকাশ করে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট যখন বাংলাদেশে আসলেন তখন তাকে একটি বই উপহার দিলেন– Politics of Bangladesh: Democracy Relegious Fundamentalism. এই বই পড়ার ফল কি হয়েছিল? সাভারের স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাতিল করলেন, গ্রামীণ ব্যাংক এর প্রকল্প দেখার কর্মসূচি বাতিল করেছেন, এই দুইটি Official document এর কারণে। তারা এবার পিলখানার ঘটনায় জঙ্গি তালাশ করেছেন, তারা মাদ্রাসায় জঙ্গি তালাশ করছেন। তারপরে জঙ্গিদের ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে ছেড়েছেন। মাদ্রাসায় জঙ্গি পয়দা হয়, আর মাদ্রাসার ছাত্ররা আর্মিতে যায়। অতএব বাংলাদেশের আর্মিও জঙ্গি হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আর্মি জঙ্গি হয়ে গেছে এই প্রচারণা প্রথমে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রথম শুরু করেছে। তারপর আমাদের দেশের একজন নেত্রীর সন্তান ও একজন মার্কিন ইহুদি আর্মি অফিসারের যৌথ প্রবন্ধে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর টিভি চ্যানেল-এর টক শো'তে একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

আমরা সরকারকে প্রথমেই বলেছিলাম, টাস্কফোর্স করার দরকার নেই। এদেশের আলেম-ওলামা ও ইসলামী দলগুলোকে আস্থায় নিন, জঙ্গি দমনের জন্য আর কিছু লাগবে না। কারণ বিগত জোট সরকারের সময় যখন ইসলামের নামে কিছু বোমাবাজী হয় তখন আমরা জামায়াতে ইসলামী বলেছিলাম– ইসলামের

নামে যারা এই অপকর্ম করে, ইসলামের সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এরা বিপথগামী, এরা বিভ্রান্ত, এরা পথভ্রষ্ট, এরা ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল। সর্ব পর্যায়ের ওলামায়ে-কেরাম ইসলামের নামে যারা বোমাবাজী করে তাদের এই ভাষায় আখ্যায়িত করে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছিল, ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। কিন্তু জনগণের পক্ষ হতে কেউ তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি। কিন্তু সরকার যে কায়দায় জঙ্গি প্রচারণা চালাচ্ছে- তাতে ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আসবে না। অন্য দিকে আমাদের প্রতিবেশী দেশের একজন জাতিসংঘে চিঠি লিখছে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের পুলিশ, সেনাবাহিনীকে নেওয়া যাবে না কারণ সেখানে জঙ্গি আছে।

তারা শিক্ষানীতির ব্যাপারে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষাকমিশন নিয়ে আসছে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি সুপারিশ করেছিল, তা তার মরহুম পিতা বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সেটা বাস্তবায়ন যোগ্য মনে করেন নাই। ৯৬-তে এটা এনেছিলেন-তখনও এদেশের কিছু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শকে সামনে রেখে তারা এটা বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছেন। এবার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভারী দেখে আর বাম রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তিদেরকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় এর দায়িত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পিতার পক্ষ হতে যে রিপোর্টকে গ্রহণ করা হয়নি সেই রিপোর্টটি যদি তিনি গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আমি বলতে চাই-আপনার পিতার আদর্শ অনুসরণ করুন। মাদ্রাসা তখন বন্ধ করার পাঁয়তারা করা হয়েছিল। মরহুম মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশের নেতৃত্বে তার পরামর্শে বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হতে বিরত ছিলেন। আমি আশা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার পিতার আদর্শ স্মরণ রাখবেন। এই দেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ, ধর্মপ্রাণ মানুষের দেশ। এই দেশ থেকে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা উৎখাতের যেকোন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না, এই জন্য যে এটা মাননীয় উচ্চতর আদালত আপীল মঞ্জুর করার আশ্বাস দিয়েছেন। কয়েকজন আইনজীবী আপিল করতে যাচ্ছেন। আপিলের আশ্বাস পাওয়ায় বিষয়টি বিচারাধীন। আমরা আশা করব সর্বোচ্চ আদালতে মাননীয় বিচারপতিগণ এই সংশোধনী বাতিলের রায়ের দোষ-ত্রুটিকে সামনে রেখে ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত নিবেন। এ রায়ের ফলে যে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যে শূন্যতার কারণে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে, দেশে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কাকে সামনে রেখে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত দিবেন। আমি শুধু বলতে চাই যে, বিগত সরকারের আমলে হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়নি। সরকারের ধারাবাহিকতার দাবী ছিল এই আপিল পরিচালনা করা কিন্তু তারা আপিলটা প্রত্যাহার করে নিলেন।

আওয়ামী লীগ এই আপিল থেকে সরে গিয়ে ইসলামের বিপক্ষে তাদের মনমানসিকতার পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন, গণতন্ত্রের বিপক্ষে তাদের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা সুখ-সুখ অনুভব করছেন। যদি আপিল প্রত্যাহর করার কারণে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়ে যায় তাহলে ৪র্থ সংশোধনীর বদৌলতে তারা একদলীয় বাকশালী শাসনে ফিরে যেতে পারবেন। ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে শুধু তাই-ই নয় অন্য দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ময়দানে এসেছে, সবগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। আগে একবার সরকার গঠন করেছে এবং এবার আবার সরকার গঠন করেছে। এই সংশোধনী বাতিল হলে পরবর্তী সব সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই পথ ধরে বিপদ তাদের জন্যও আসতে পারে। এই সুযোগে অসাংবিধানিক কোন শক্তি আবার ক্ষমতা দখলের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবেন। যাতে করে দেশ সামনে কোন অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে না যায়।

আমি আর কথা বাড়াতে চাই না, আমি প্রথমেই বলেছি জামায়াতে ইসলামী কোন দল বিশেষের বা বিশেষ কোন দেশের বিরুদ্ধে নয়। জামায়াতে ইসলামী অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, দেশের স্বার্থ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপোষহীন ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত। একই সাথে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, দেশের পক্ষে, গণতন্ত্রের এবং ইসলামের পক্ষে জামায়াতে ইসলামী যেকোন পরিস্থিতিতে আপোষহীন ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। বর্তমানে টিপাইমুখ যে ইস্যু বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর জন্য, আমাদের প্রতিবেশী দেশের পক্ষ হতে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এই ইস্যু কোন দলের ইস্যু নয়, এই ইস্যু ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ দেশ গোটা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের ইস্যু। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারকে ভারতের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা করে হোক বা আন্তর্জাতিক ফোরামে গিয়ে হোক এই বাঁধ দেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে হবে। এই আহ্বান দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্য, যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্য, জাতীয় বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য, আমি আপনাদের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে গোটা বাংলাদেশের জন-মানুষের কাছে, এই আবেদন ও আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ।